International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IV, Issue-II, September 2017, Page No. 1-10
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

"গ্রামীণ হাওড়ার কথ্যভাষার অলিখিত আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য : একটি ক্ষেত্রসমীক্ষা ও পর্যালোচনা"

ড. সুশান্ত ঘোষ
ফেলো, ফি রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি, লন্ডন ও অধ্যাপক সরকারি মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Howrah is the smallest district of West Bengal, Howrah district have two parts, Howrah town and rural Howrah. Linguistically rural Howrah is different from town or metro Howrah, we found 'Haor' and 'Betore' in the Manasamangal, and the Annadamangal. In the Medieval Bengali Literature many popular writer was born at Howrah; Roygunakar Bharat Chandra, the last poet prominent poet of medieval Bengali Literature, Jadavnath Pandit or Jadunath Pandit a prominent poet of 'Dharmamangal' was born at Howrah. Linguistically Howrah district is under 'Rarhi' dialect of Bengali main Language. But town and Metro Howrah using a new hybrid Bengali of their daily communication. They used Bengali with mixed of Hindi, Urdu and English. 'Gramin Howrah' or 'Rural Howrah' using the traditional Bengali in their regular communications. The village dwellers using their regional Bengali is different way. They using some local verb, local word, and many other local linguistical diversity. Here we analysis these local characteristics we used field survey and comparative study for this analysis.

পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার স্থানীয় কথ্যভাষা রাঢ়ী উপভাষার অন্তর্গত হলেও গ্রামীণ স্তরে সর্বদা রাঢ়ী উপভাষার ধর্মগুলি পালিত হয় এমন নয়। গ্রামীণ হাওড়ার ভাষায় রাঢ়ীর বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াও নিজস্ব কিছু ছাপ রয়েছে। যা একান্তভাবেই হাওড়ার গ্রামীণ অঞ্চলের কথ্যভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে দেখেছি হাওড়া জেলার বাঙালি সমাজ মূলতঃ দুটি ভাগে বিন্যস্ত। একটি ভাগে আছে শহরকেন্দ্রিক বাঙালি সমাজ যারা মূলতঃ ভাষার ঘষামাজা করে হিন্দি ইংরেজি মিশিয়ে একটি ভাষারীতি তৈরি করেছে, তাদের কাছে বাংলার গ্রামীণ অঞ্চলের অন্যান্য সংস্কৃতি ও ভাষারীতি যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। আর একদিকে হাওড়া গ্রামীণ অঞ্চল এখনো তাদের প্রচলিত লোকসংস্কৃতি ও ভাষারীতি বজায় রেখেছেন। এর কারণ গ্রামীণ হাওড়ার জনগন মূলতঃ গ্রামকেন্দ্রিক জীবনযাপন করেন এবং শহরের হাওয়া এসে উপস্থিত হলেও তাদের কাছে তা এখনো পূর্ণমাত্রায় পোঁছায়নি। বাংলা ভাষায় পাঁচটি উপভাষার অন্যতম 'রাঢ়ী'। প্রাচীনকালে রাঢ় অঞ্চল বলতে হাওড়া সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোকে বোঝাত। সেই সব অঞ্চলের কথ্য বাংলা ভাষাকে রাঢ়ী উপভাষা বলা হয়ে থাকে। হাওড়া হুগলি, কোলকাতা, নদীয়া সহ অন্যান্য দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে রাঢ়ীভাষার প্রচলন হলেও এবং রাঢ়ী ভাষার মূলবৈশিষ্ট্যগুলি বজায় থাকলেও। জেলাগুলির অঞ্চলভেদে কিছু কিছু অতিরিক্ত স্থানিক বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলি একান্তভাবেই ঐ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অন্য অঞ্চলের সঙ্গে সেটি মেলে না। এইভাবে হাওড়া গ্রামীণ অঞ্চলের ভাষার মধ্যেও এমন অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যা অন্য কোন অঞ্চলে বা শহর হাওড়ার কথ্যভাষার মধ্যেও প্রায় মেলেনা। এই অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যগুলিই আমরা অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছি। হাওড়ার গ্রামীণ অঞ্চল বলতে আমরা বলি গ্রামীণ অঞ্চল থেকে নারনা দয়ারপুর ভোমজুর হয়ে বড়গাছিতা, উদয়নারায়ণপুর, আমতা, বাকসী হয়ে উলুবেড়িয়া পর্যন্ত অঞ্চলকে ধরা হয়েছে। এই অঞ্চলগুলির মধ্যে আবার

পুরসভা ও শহর রয়েছে আমরা সেগুলিকে বাদ দিয়েছি কারণ সেই অঞ্চলগুলিতে বাংলাভাষার আরও একটি রূপ দেখা যায়, মূলতঃ বিহারী ও হিন্দী ভাষার প্রভাবে বাংলাভাষার অনেকরূপ বদল ঘটেছে কারণ এই সব শহর হয় শিল্পাকল না হয় রেলশহর। যাই হোক আমরা এখানে হাওড়ার গ্রামীণ অঞ্চলের কথ্য ভাষার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে অগ্রসর হবো।

গ্রামীণ হাওড়ার কথ্যভাষায় সামান্য অতীতকালে 'লুম' ব্যবহৃত হয় যে শহর হাওড়ার 'লুম' এর বদলে 'লাম' ব্যবহৃত হয় বেশি। কেননা 'লাম' ব্যবহৃত ক্রিয়াপদের সৃষ্ট রূপ কথ্য চলিতের মান্যরূপ পেয়েছে। তাই শহরের মানুষ 'বললাম' 'করলাম' 'গেলাম' বললেও গ্রামীণ হাওড়ায় এখনো 'লুম' ব্যবহার করে বললুম, করলুম, 'গেলুম' বলা হয় এবং দ্রুত উচ্চারণের সময় এগুলো পরিবর্তিত হয়ে 'বল্লুম' 'কল্লুম' ইত্যাদি উচ্চারণ হয়ে থাকে। অর্থাৎ 'রং' স্থলে 'ল' হয়ে যায়। মোটকথা 'লুম' প্রত্যয়টি এখনো হাওড়া গ্রামীণ কথ্য ভাষায় পুরোপুরি বজায় আছে।

যেমন— 'জানো তো মা ভাইকে বল্লুম (বললুম) জল পড়ছে, ইস্কুলে যাস্‌না ভাই শুনলো না।'

কিন্তু শহরের হাওড়ার বক্তা 'লাম্' ব্যবহার করে বলবেন—

যেমন— ভাইকে বললাম যে বৃষ্টি পড়ছে, স্কুলে যাস্‌না ভাই শুনলো না।

'প্রবেশ করা' অর্থে গ্রামীণ হাওড়ার কথ্যভাষায় একটি বিশেষ ক্রিয়ার ব্যবহার করা হয়, সেটি অন্যত্র দেখা যায় না। শহর হাওড়ার মানুষ এটি ব্যবহার করে না। 'প্রবেশ করা' অর্থে 'সেধাচ্ছে' বা সেধোচ্ছে বা গ্রামীণ উচ্চারণে 'সেঁদোচ্ছে' ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই 'সেঁদোচ্ছে' শব্দটি 'ঝাড়খন্ডী' উপভাষায় কখনো সখনো ব্যবহৃত হয়। এই ক্রিয়াটির আবার কালানুযায়ী ব্যবহারের রূপ ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন—

(১) খোকার মনের মধ্যে ভয় সেঁদ্দেছে। (বর্তমান কাল)
(২) খোকার মনের মধ্যে ভয় সেঁধোচ্ছে। (ভবিষ্যত কাল)
(৩) খোকার মনের মধ্যে ভয় সেঁদ্দেছিল। (অতীত কাল)

অর্থাৎ এই ক্রিয়াপদটির ব্যবহার গ্রামীণ হাওড়ার কথ্যভাষায় গুরুত্বপূর্ণ ও বহুল ব্যবহৃত ক্রিয়াপদ হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু শহর হাওড়ার কথ্য ভাষায় এই ক্রিয়াপদটির ব্যবহার প্রায় নেই। তারা 'খোকা' শব্দটিও 'অভদ্র' শব্দ হিসাবে দেখে এবং এর ব্যবহার প্রায় করেই না বরং খোকার স্থলে 'বাবু' শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। যেমন—

(১) বাবুর মনের মধ্যে ভয় ঢুকছে। (বর্তমান কাল)
(২) বানুর মনের মধ্যে ভয় ঢুকেছে। (ভবিষ্যত কাল)
(৩) বাবুর মনের মধ্যে ভয় ঢুকেছিল (অতীত কাল)

অনেকে 'ঢুকছে' 'ঢুকেছে' ক্রিয়াপদগুলিকে অশিষ্ট অর্থের দ্যোতক ভেবে 'প্রবেশ করছে' 'এসেছে', 'এসেছিল' আসছে' প্রভৃতি কালানুযায়ী ক্রিয়ার ব্যবহার করে থাকে। যেমন—

বাবুর মনের মধ্যে ভয় প্রবেশ করছে।
অথবা
বাবুর মনের মধ্যে ভয় আসছে।

সুতরাং হাওড়ার গ্রামীণ অঞ্চলের কথ্যভাষার নিজস্ব এই রীতিটি এখনো ব্যবহৃত হয় পূর্ণমাত্রায়।

'বলা' অর্থে 'কইছি' ক্রিয়াটির ব্যবহার গ্রামীণ হাওড়ার কথ্য ভাষার ব্যাপক ব্যবহৃত হয়। শহর হাওড়ার শিক্ষিত সমাজে 'বলা' অর্থে বলেছি ব্যবহার হয়ে থাকে। কালানুযায়ী 'কওয়া' শব্দটির ব্যবহার দেখা যায় গ্রামীণ হাওড়ার কথ্যভাষায়। যেমন—

(১) তোমাকে কইছি যাব না আমি। (বর্তমান কাল)
(২) তোমাকে কইছিলাম তো যাব না আমি। (অতীত কাল)
(৩) তোমাকে কইব বলে ভেবেছিলুম আমি যাব না। (ভবিষ্যৎ কাল)

'কইছি' 'কইছিলাম' 'কইব' ইত্যাদি শব্দ 'কওয়া' থেকে এসেছে। 'বলা কওয়া' একটি শব্দবন্ধ কথায় একত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন—

বলা কওয়া নেই একদম চলে এলে।

এই 'বলা' আর 'কওয়ার' অর্থ কিন্তু একই। 'বলা' থেকে 'বলেছি' 'বলেছিলুম' বলব, এবং 'কওয়া' থেকে 'কইছি' কইছিলুম' 'কইন' একই অর্থে প্রযুক্ত কিন্তু গ্রামীণ হাওড়ার জনগণ 'বলা' থেকে 'কওয়া' বেশি ব্যবহার করেন এবং এটি গ্রামীণ হাওড়ার কথ্যভাষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। প্রসঙ্গত- বলা দরকার 'কওয়া' ধাতুর যোগে ক্রিয়াপদের সৃষ্টি পূর্ববঙ্গের কথ্যভাষার বৈশিষ্ট্য যদিও সেখানে কইছি না বলে 'কইসি' অর্থাৎ 'ছ' কে 'স্' উচ্চারণ করা হয়।

'টাঙানো' ও খাটানো' এই দুটি ক্রিয়াপদ গ্রামীণ হাওড়ার কথ্য ভাষায় সমান্তরাল ভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'প্যান্ডেল খাটানো' 'মশারী খাটানো' যেমন বলা হয়ে থাকে তেমনি 'ছবি টাঙানো' 'ট্যং টাঙানো' (ট্যং মানে টিনের তৈরি অস্থায়ী ঘর)। 'গুমটি টাঙানো' পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়। যদিও দুটি শব্দের অর্থ প্রায় একই। যেমন— দুর্গা পূজোয় প্যান্ডেল খাটানো হচ্ছে সেই প্যান্ডেলে মহাপুরুষদের ছবি টাঙানো হবে।

গ্রামীণ হাওড়া মূলত কৃষিনির্ভর। রবি শস্যের পাশাপাশি খারিফশস্য তারা চাষবাস করে থাকে। এবং সেই চাষবাসের জন্য দরকার জমিকে উপযুক্ত ভাবে তৈরি করা। 'পরিপাট্য' শব্দটিকে সংক্ষেপে 'পাট' বলে ব্যবহার করে গ্রামীণ হাওড়ায়। এই 'পাট' কেবল 'শাড়ি'কে 'পাট' করে রাখা অর্থে নয়। জমির মাটিকে উপযুক্তভাবে তৈরি করাকেও 'পাট' বলে থাকে। অর্থাৎ নতুন শাড়ি যেমন ভাঁজ করে বা 'পাট' করে রাখতে হয় তার নতুনত্ব বজায় রাখার জন্য তেমনি জমিকেও 'পাট' করতে হয় মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য। যেমন—

-- খুকি কাপড়টা পাট করে বাক্সে রেখে দে তো মা।
-- তেমনি চাষের জমির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় 'পাট' শব্দটি।
-- জমিতে খোল সার দিয়ে পাট করলুম তবু ফসল ভালো হল না।

এখানে 'খোল' (খইল) সার দিয়ে জমিকে উপযুক্ত করা হলেও চাষ করে ফসল আশানুরূপ হয়নি। এই অর্থে দেখা যায় 'পাট' শব্দটির বহুবিধ ব্যবহার যা একান্তভাবেই গ্রামীণ হাওড়ার কথ্য ভাষায় বৈশিষ্ট্য। এই চাষের জমির প্রসঙ্গেই আরও একটি ক্রিয়াপদ আমরা পেয়েছি যেটি একমাত্র গ্রামীণ হাওড়ার চাষী পরিবারই এর অর্থ জানে। সেটি হল 'খুঁটনো'। চাষ হয়ে যাবার পর জমির মাটিকে কোদালের সাহায্যে সারি করে উলটে দেবার স্থানীয় পদ্ধতিকে বলে 'খুঁটনো'। জমিতে থাকে ঘাস পাতা, উল্টে দিলে সেগুলি চাপা পড়ে পচে গিয়ে জৈব্যসার তৈরী করে যা জমির উর্বরতা শক্তি বাড়ায়। আমরা অনুসন্ধান করে দেখেছি 'ঘুঁটানো' শব্দটি আসলে 'কুটানো' চলতি কথায় 'কুটনো' শব্দ থেকে আগত। 'কুটানো' বা 'কুটনো' শব্দের অর্থ 'টুকরো করে কাটা' যেমন 'খড় কুটানো' অর্থাৎ 'খড়' বা বিচালিকে টুকরো করে কাটা কিংবা 'সবজি কুটানো' অর্থে সব্জিকে টুকরো করে কাটা অর্থে ব্যবহৃত করা হয়ে থাকে। তেমনি জমির মাটিকেও কোদালের সাহায্যে টুকরো করা হয়ে থাকে বলেই বোধ হয় 'কুটানোর মতো' খুঁটানো শব্দটির প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। 'কুটনো কাটা' অবশ্য সব্জিকে টুকরো করে কাটা অর্থেই একমাত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এখানে 'কুটনো' অর্থে সবজি ভাবা হলেও তা নয় কুটনো অর্থে টুকরো

করে কাটা অর্থকেই বোঝায় যদিও 'দাঁড়িয়ে' পাটিয়ে প্রভৃতি ক্রিয়াদ্যোতক শব্দগুলি গ্রামীণ হাওড়ার প্রচলিত কথ্যভাষার ছাঁদে ভিন্নরকম উচ্চারিত হয়। এই রীতিটি কেবল গ্রামীণ হাওড়ার কথ্য ভাষাতেই দেখা যায়।

দাঁড়িয়ে > দাঁইড়্যে
পাটিয়ে > পাট্‌ট্যে

যেমন— তোমার জন্য অনেকক্ষণ ধরে দাঁইর‍্যে আছি। মা তোমার জন্য মিষ্টি পাট্‌ট্যে দিলো।

রাঢ়ী উপভাষার মান্য রূপে দাঁড়িয়ে, 'পাটিয়ে' প্রচলিত হলেও হাওড়ার গ্রামীণ ভাষায় এগুলি নিজস্ব ভঙ্গিমায় ও রীতিতে উচ্চারিত ও ব্যবহৃত হয়।

হাওড়ার গ্রামীণ কথ্যভাষায় কিছু কিছু স্থানে মহাপ্রাণ ধ্বনির সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটে থাকে। 'হ্' ধ্বনিটি উচ্চারিত হয় না। যেমন—

নরসিংহ - নরসিং
মাকড়দহ - মাকড়দ

যেমন—মাকড়দ থেকে বাসে উঠে নরসিং দত্ত কলেজে গেলুম কাল।

হাওড়ার গ্রামীণ কথ্যভাষায় নাসিক্যভবন ঘটে অনেক স্থান নাম উচ্চারণে যা শহর হাওড়ার কথ্যভাষায় দেখা যায় না। যেমন—

আন্দুল > আঁদুল (হাওড়ার একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু জনপদ)
চন্দ্রপুর > চাঁদপুর

আবার 'পুঁইল্যা' 'দুইল্যা' ইত্যাদি স্থান নাম স্বাভাবিক উচ্চারণ করলেও অনেক ক্ষেত্রে 'া' ফলার উচ্চারণ হয় না—

পুঁইলা, দুইলা ইত্যাদি উচ্চারণ করে থাকে।
কোন কোন ক্ষেত্রে শব্দের শেষে থাকা 'ী' (ঈ) উচ্চারণ থেকে বাদ দিয়ে দেয় ও নিজস্ব ভঙ্গিমায় উচ্চারণ করে থাকে। যেমন—

ধূলোগোড়ী > ধুলোগোড়

অনেকক্ষেত্রেই স্থান নামকে সংক্ষিপ্ত করে বলা গ্রামীণ হাওড়ার মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। যেমন—

সালকিয়া > সালকে
বড়গাছিয়া > বড়গেছ
বিপন্নপাড়া > বন্যাপাড়া
ঝালুয়ারবের > ঝেলেবের

গ্রামীণ হাওড়ার কথ্য ভাষায় অনাকাঙ্ক্ষিত স্বরসঙ্গতি দেখা যায়। যেখানে স্বরসঙ্গতি (Vowel Harmony) না হলেই ভালো হত। বিশেষত স্থান নামের ক্ষেত্রে এই প্রবণতা অনেক বেশি। যেমন—

ডোমজুর > ডুমজুর
রাঘবপুর > রাঘুবপুর
মনসা > মনোসা
ফ্ল্যাট > ফেলাট

যদিও স্থানীয়ক্ষেত্রেই এগুলো ব্যবহার হয়, লেখার সময় আসল রূপটিই লেখা হয়।

গ্রামীণ হাওড়ার কথ্য ভাষায় স্বরসঙ্গতির মতো ব্যঞ্জনসংগতি বা সমীভবনও দেখা যায় স্থানীয় উচ্চারণে। যেমন—

নারনা > নান্না

খন্যান > খন্নান

'নারনার বাবা পঞ্চানন্দ খুব জাগ্রত' বলতে গিয়ে প্রায় সকলেই বলে 'নান্নার বাবা পঞ্চানন্দ খুব জাগ্রত।'

স্থাননামের সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ গ্রামীণ হাওড়ার কথ্যভাষার একটি রীতি হলেও সর্বক্ষেত্রে তা পালিত হয়নি। যেমন—

উলুবেড়িয়া > উলুবেড় হলেও তার পাশের গ্রাম বাউড়িয়া

কিন্তু 'বাউড়ে' হয়নি স্থানীয় কথ্য ভাষায় বাউড়িয়াই রয়ে গেছে।

একইভাবে বড়গাছিয়া > বড়গেছ্ হলেও ঢাকুরিয়া থেকে 'ঢাকরে' হয়নি। একই রয়ে গেছে।

অনেকক্ষেত্রে অযোগবাহ ধ্বনি 'ং' অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে শব্দের মাঝে এসে শব্দমধ্যস্থ 'ক্' ধ্বনির স্থানে বসে যায় এবং 'ক' ধ্বনির স্থানে বসে যায় এবং 'ক' পুরোপুরি অপমৃত হয়ে যায় এবং 'ং' এর উচ্চারণ হয়ে থাকে স্থানীয় গ্রামীণ হাওড়ার কথ্যভাষায়। যেমন—

কাঁকড়া > কাঁংড়া (কোথাও কোথাও 'কেংড়া' ও ব্যবহৃত হয়)
বাঁকড়া > বাঁংড়া

ব্যক্তিনামের শেষে 'ন্ত' থাকলে হাওড়ার গ্রামীণ কথ্যভাষায় তার উচ্চারণ পুরোপুরি হয় না। 'ত' বাদ দিয়ে নামটি উচ্চারণ করা হয়ে থাকে। যেমন—

শ্রীকান্ত > শ্রীকান (গ্রামের উচ্চারণে 'শিকান' হয়ে যায়)
শ্রীমন্ত > শ্রীমন (বিকেলে শিমনদের বাড়ি যাব - এভাবে বলা হয়)।

অনেকক্ষেত্রে শব্দমধ্যস্থ মহাপ্রাণ ধ্বনি 'হ্' লোপ পায় কেবল নয় তার সাথে যুক্ত থাকা স্বরধ্বনিটিও অবলুপ্ত হয়ে যায় পাশের স্বরধনির প্রভাবে। ফলে মূলশব্দটি দারুণভাবে সংক্ষিপ্ত হয়ে যায় ও বিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন—

বলুহাটি > বলুউটি (বা 'বোলউটি' একেবারে প্রত্যন্ত উচ্চারণে)

এখানে প্রকৃতশব্দ 'বলুহাটি' (ডোমজুর ব্লকের একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম) কিন্তু স্থানীয় উচ্চারণে সেটি বিকৃত ও সংক্ষিপ্ত হয়ে 'বলুউটি' বা 'বোলউটি' হয়ে গেছে। দেখা যাচ্ছে 'হ' মহাপ্রাণ ধ্বনিটি তার সাথে থাকা 'আ' সকরধনি সমেত লুপ্ত হয়ে গেছে এবং তার স্থলে 'স্বরসঙ্গতি' হয়ে 'উক্তি' হয়েছে এবং প্রকৃত শব্দ বলুহাটির স্থলে গ্রামীণ উচ্চারণ দাঁড়িয়েছে 'বলুউটি'।

আবার কোথাও ব্যঞ্জনলোপ ও নাসিক্যভবন স্বরসঙ্গতি ঘটেছে কোন কোন শব্দ উচ্চারণের সময়। যেমন—
বামুনগাছি > বাঁইগাছি
হেলেঞ্চা > হিঁনচে

'ঋ' এর উচ্চারণ অনেক সময়ই 'র' এর উচ্চারণ হয়ে দাঁড়ায়। স্থানীয় কথ্যভাষায় 'ঋ' এর জটিল উচ্চারণ বাদ দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন—

মৃগেল > মিরগেল (মাছ বিশেষ)
হৃষিকেশ > রিষিকেশ

এখানে দুটি শব্দের ক্ষেত্রেই 'ঋ' এর যথার্থ উচ্চারণকে ব্রাত্য করে 'র' কে উচ্চারণ করা হয়েছে। যেমন—

'হৃষিকেশ বাজার থেকে মৃগেল মাছ কিনে এনেছে'। বাক্যটি স্থানীয় উচ্চারণে এভাবে বলা হয়।
'রিষিকেশ বাজার থেকে মিরগেল মাছ কিনে এনেছে।'

অস্ত্যর্থক অর্থে 'না' এর ব্যবহার হাওড়ার গ্রামীণ কথ্য ভাষায় একটা বৃহৎ অংশে ব্যবহৃত হয়। হ্যাঁ বোঝানোর জন্য 'না' শব্দটির ব্যবহার দেখানো হয়। এসব ক্ষেত্রে 'না' শব্দটি ক্রিয়ার পূর্বে বসে কদাচিৎ পরেও ব্যবহৃত হয়। যেমন—

আমি কি তোমায় যেতে না করেছি। (অর্থাৎ নিষেধ করা হয়নি)
আবার
তুমি তো আমায় ত্যাগ করলে না। (বর্জন করেনি অর্থে)

অবশ্য এ প্রবণতা গ্রাম শহর প্রায় সর্বত্র দেখা যায়। 'মাইরি' (মা মেরি শব্দটি হাওড়ার গ্রামীণ অঞ্চলে প্রচলিত থাকলেও শহরে এর স্থলে এখন 'ওন গড' বলছি ব্যাপক ব্যবহৃত হয়ে 'মাইরি বলছি' শব্দটিকে প্রায় ভুলিয়ে দিয়েছে।

হাওড়া জেলার গ্রামীণ কথ্যভাষায় মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ করে উচ্চারণ করার একটা প্রবণতা থাকে। এটা যে কেবল অশিক্ষিত উচ্চারণে দেখা যায় এমন নয়, অনেক সময় শিক্ষিত ব্যক্তিও এই ধরণের উচ্চারণে সামিল হয়। হাওড়ার দফরপুর বড়গাছিয়া, ঝাঁপড়দহ ইত্যাদি অঞ্চলের শিক্ষিত উচ্চারণেও অনেক সময় এই পরিবর্তন সচরাচর দেখা যায়। যথা—

কাঁঠাল > ক্যাঁটাল (লিখিত হলে হবে 'কেঁটাল')
টিভি > টিবি,
লাঠি > লাটি প্রভৃতি।

ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় আমরা এও দেখেছি প্রত্যন্ত জনপদে 'ম্' এই নাসিক্য ধ্বনিটি উচ্চারণের সময় 'ব্' ধ্বনিতে পরিণত হয় এবং নাসিক্যীভবন ঘটে থাকে। গ্রীষ্মকালীন ফল 'আম' শব্দটিকে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের জিহ্বায় 'আঁর' করে উচ্চারণ করে থাকে। অর্থাৎ 'আম' > আঁর রূপে উচ্চারিত হয়। ডোমজুর ব্লকের প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে এই উচ্চারণ প্রবণতা দেখা যায়। ব্যাকরণগত দিক থেকে দেখলে দেখা যায় 'ম' এই নাসিক্যধ্বনি লোপ পেয়েছে এবং পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির নাসিক্যীভবন ঘটেছে এবং 'ম্' এর শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য পূর্ববর্তী অল্পপ্রাণ ধ্বনি এসে বসে। এইরকম ভাবেই অন্যত্রও আমরা লক্ষ্য করেছি এই রীতিটির ব্যবহার। যথা—
লেমোনেট > ন্যাঁবেনেট

'ল্' কে 'ন্' উচ্চারণ রাঢ়ীর মুখ্য একটি বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এখানে এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ নাসিক্য ব্যঞ্জনের লোপ হয়ে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি অনুনাসিক হচ্ছে অর্থাৎ নাসিক্যীভবন ঘটেছে এবং 'ম' এর অভাব পূরণ করতে পূর্ববর্তী অল্পপ্রাণ ধ্বনি 'ব' এর উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে। এই বৈশিষ্ট্যটি হাওড়ার সব গ্রামীণ কথ্য ভাষায় দেখা যায় না। বর্তমানের শিক্ষিত প্রজন্ম এই ধরনের উচ্চারণ এড়িয়ে চলে। কিন্তু প্রাচীন বয়স্ক বয়স্করা এখনো এইভাবে কথা বলে থাকে।

অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় 'শব্দমধ্যস্থ' 'ব্' বা 'ট' ধ্বনি লোপ পায় এবং 'ব্' বা 'ট্' ধ্বনির পূর্ববর্তী স্বাধীনভাবে থাকা স্বরধ্বনিটি জোর দিয়ে উচ্চারিত হয়। যথা—

টিউব লাইট > টিউ লাইট
নাইট ডিউওটি > নাই ডিউটি

হাওড়ার গ্রামীণ অঞ্চলের কথ্যভাষায় লক্ষ্য করা যায়, শব্দের শেষে স্বরধ্বনি যুক্ত বা বিযুক্ত যেভাবেই থাক তার লোপ হয়ে যায়। যথা—

কড়াই > কড়া
চ্যাঁটাই > চ্যাঁটা (নারকেল পাতা দিয়ে বানানো বসার আসন বিশেষ)

পিরিতি > পিরিত
বলাই > বলা

কখনো কখনো দেখা যায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম আছে অনেক। যেমন—

মরাই > মরা হয়নি। (মরাই অর্থাৎ ধানের গোলা)।

অনেক সময় গ্রামীণ উচ্চারণে দুটি সমধ্বনি একটি শব্দে পাশাপাশি অবস্থান করলে দুটি মিলে একটি ব্যঞ্জনধ্বনিতে পরিণত হয় এবং উচ্চারণেও একটিই 'ধ্বনি' উচ্চারিত হয়। যথা—

মিল্ককেক > মিল্কেক

আবার কোন কোনও শব্দকে উচ্চারণের সময় দেখা যায় যুক্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে থাকা নাসিক্যধ্বনি লোপ পায় এবং পূর্বের ধ্বনিটি অবিকৃত থাকে। যথা—

প্রেত্নি > প্রেতি

কোনও কোনও অঞ্চলে শব্দমধ্যস্থ 'ই' কার লোপ পায় এবং তার ফলে তার সঙ্গে থাকা স্বরধ্বনিটি পৃথকভাবে উচ্চারিত হয়। যথা—

মিহিদানা > মিইদানা

(বর্ধমানের মিহিদানা সীতাভোগ খুব বিখ্যাত। বাক্যটি বলার সময় মিহিদানা নয় উচ্চারণ করে 'মিইদানা'।)

কোথাও কোথাও শব্দমধ্যস্থ ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে থাকা যুক্ত স্বরধ্বনি লোপ পায়। এবং ব্যঞ্জনধ্বনিটি জ্যোরের সঙ্গে উচ্চারিত হয় (অর্থাৎ শ্বাসাঘাত পড়ে)।

চকোলেট > চক্‌লেট

উদাহরণ : বুড়িমার চক্‌লেট বোম খুব বিখ্যাত।
(বোম অর্থাৎ 'বম' অ কে 'ও' উচ্চারণ রাঢ়ীর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য)

হাওড়ার জগৎবল্লভপুর ও আমতা ব্লকের বিভিন্নগ্রামে নঞর্থক শব্দ হিসাবে 'না' এর স্থলে 'নে' ব্যবহার করে থাকে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দুই ভাবেই 'নে' ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। উত্তম পুরুষ, কিংবা প্রথম পুরুষ সবক্ষেত্রেই এমন ব্যবহার আছে। যথা—

'আমার পড়া হয়নে তাই ইস্কুলে যাব না'। যখন বক্তা নিজেই নিজের বক্তব্য বলছে তখনও 'নে' ব্যবহার দেখা যায় আবার যখন বক্তা নিজের সম্পর্কে না বলে অপরের সম্পর্কে বলে অর্থাৎ পরার্থে বলে তখনও নঞর্থক হিসাবে 'নে্' এর ব্যবহার দেখা যায়। যথা—

'রামের পড়া হয়নে তাই পড়তে আসেনে (বা আসেনি)।

এভাবেই 'পড়া পারেনে' 'গান করেনে' ভাত খায়নে' ব্যবহার হয়ে থাকে।
হাওড়ার গ্রামীণ কথ্য ভাষায় যৌগিক ক্রিয়ার 'না' বাচক অর্থেও 'নে' র ব্যবহার আছে।
করা হয়নে, ধরা হয়নে, পাড়া হয়নে (আমপাড়া হয়নে)।

হাওড়ার অঞ্চল বিশেষে দেখা যায় 'ছাঁচ' ও 'ছেঁচো' শব্দ দুটির ব্যাপক ব্যবহার আছে। 'ছাঁচ' কিন্তু 'dise' অর্থে ব্যবহার করা হয় না। এর ব্যবহারিক অর্থও একরকম নয়। এর ব্যবহার ক্ষেত্রবিশেষে বিভিন্ন অর্থদ্যোতক। যেমন—

(১) ছাঁচ খোলা – অর্থাৎ তেল না দিয়ে পাত্রের মধ্যে কিছু ভাজা করা।
(২) ছাঁচ পোড়া – অর্থাৎ তেল না দিয়ে বেশি করে পুড়িয়ে ফেললে।

(৩) ছাঁচ তলা – অর্থাৎ যেখানে টালির জল পড়ে বাড়ির সামনে সেই অঞ্চলটিকে বোঝায়। (গ্রামের বেশিরভাগ ঘর টালির ও চারবালা ধরনের। বৃষ্টির জল সামনের দিকে উঠানে এই চাল বেয়ে পড়ে। সেখানকে ছাঁচতলা বলে। 'খোলা' আর 'টালি' এক হলেও 'খোলা' শব্দটি রান্নার পাত্র বা ভাজা করার পাত্রকেও বোঝায় এমনকী সব্জির খোসাকেও বোঝায় যথা—

লাউয়ের খোলা পাঁচফোড়ন দিয়ে ছাঁচ খোলায় ভাজলে ভালো খেতে হয়।)

অপরিচ্ছন্ন বা নিষিদ্ধ স্থান অর্থেও 'ছাঁচ' এর ব্যবহার আছে তবে তা একটি বিশেষ স্থানের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়।

'ছাচতলা আঁশতলা' করলে শরীর খারাপ হবে না তো কী হবে।
এই 'ছাঁচতলা আঁশতলা' শব্দবন্ধটির ব্যবহার আছে বাগধারা হিসাবেও।

'ছেঁচো' শব্দটির প্রয়োগ আছে একটি বিশেষ অর্থে। অর্থাৎ 'ছাঁচ' তলায় থাকা বিশেষ ধরনের প্রেত্নীকে ডাকা হয় এই শব্দের ধারা। গ্রামের প্রত্যন্ত মানুষের ধারণা 'ছেঁচোপেতি' থাকে ছাঁচতলায়, তাই তারা সন্তানাদি সকলকে ভরসন্ধ্যায় 'ছেঁচতলায়' যেতে নিষেধ করে। (আমাদের মনে হয় চালের সব নোংরা বৃষ্টির সময় এই স্থানে ধুয়ে এসে জমা হয়। তাই এই স্থানে রোগজীবাণু থাকতে পারে। সেটিকেই গ্রাম্য ধারণার অভিজ্ঞতা থেকে 'ছেঁচোপেতি' বলা হয়েছে।

গ্রামীণ অঞ্চলে 'মটকা' শব্দটির বহুঅর্থের ব্যবহার দেখা যায়। 'মটকা' মানে উপরে থাকা এক ধরনের ত্রিভুজাকার টালিকে যেমন বোঝায় তেমনি 'মটকা মারা' অর্থে জেগে ঘুমানোর ভান করাকেও বোঝায়। যেমন—

(১) কালকে হুনুমানে দুটো মটকা (খোলা) ভেঙে দিয়েছে।
(২) মটকা মেরে পড়ে সব কথাই শুনেছে রহিম।

'যজ্ঞ' শব্দটি রাঢ়ীতে 'যগ্‌গো' হিসাবে উচ্চারিত হলেও হাওড়ার গ্রামীণ অঞ্চলে সবক্ষেত্রে এটি পালিত হয় না। 'যজ্ঞ' শব্দটি 'যোগে' উচ্চারিত হয়। অবশ্য এটি একটি শব্দের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়—

যজ্ঞডুম্বুর > যোগেডুমুর।

('যোগ্‌গে' দেওত্তা হয় যে ডুমুর এই যোগ্‌গে থেকেই 'যোগে' এসেছে)

অনেক অপ্রচলিত শব্দ গ্রামীণ হাওড়ার কথ্য ভাষায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এখনো। শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকলেই বলে থাকে এই শব্দগুলো। এগুলি গ্রামীণ হাওড়ার কথ্য ভাষার সম্পদ।

বনেদ – বাড়ির ভিত
কঙ্কা – লালনটে শাক
গাঁদাল – গন্ধভেদালি
মুদ্দ – মৃতদেহ
মুদ্দফরাস – ডোম বা মৃতদেহ বহনকারী
পগার – জলবাহী তথা সীমানা নির্ণায়ক নালা
পইটে – সিঁড়ি
কেঁদেল – কলার কাঁদি
পেটকো – কলার গাছের খোসা
পাঁজা – কাঁচা ইটের গাদা
তেমানি – তিনরাস্তার মিলনস্থল

ঝাসখানা – নোংরা ফেলার স্থান।

শাকসব্জি, ফসলের নাম, স্থান ও বিবিধ বস্তুর উচ্চারণের ক্ষেত্রে স্থানীয় উচ্চারণ দেখা যায়। যা মূল শব্দ থেকে পৃথক হয়ে যায়।

মকাই > মক্কা
পিয়ারা > প্যায়রা
সাজিনা > সজনে (কোথাও সয়না বলাও হয়)
পেঁয়াজ > পেঁজ
নারিকেল > নারকেল (কোথাও নাক্‌কেল)
পিঠা > পিটে
ধ্রুব > ধোপো
প্রদীপ > পিদিম
সূর্য > সুজ্জ
পূর্ণিমা > পুন্নমে
অমাবস্যা > আমাবস্যে
খইল > খোল
কলাই > কড়াই
ডাক্তার > দাক্তার
গ্রহণ > গেরন
উৎসর্গ > উচ্ছুব্বু

কোন কোন দ্রব্যের নাম একান্তভাবেই স্থানীয় শব্দ দিয়ে বোঝানো হয়। যেগুলি হাওড়ার গ্রামীণ অঞ্চলের বাইরে প্রচলিত নেই প্রায়।

ছাঁচি কুমড়ো (চালকুমড়ো)
হোঁপা (চিচিঙ্গে)
কুঁড়ুক (চত্রাক)
বোল (বোয়ালমাছ)
হেলাফুল (শ্যাপলা ফুল)
বেতো শাক (বাথুয়া শাক)
প্যাঁকাটি ((পাটকাঠি)
পুরুষ্টু (পরিপুষ্ট)

তিজেল হাঁড়ি – অর্থাৎ ছোটপাতলা পোড়া মাটির হাড়ি।
ঘটঘাটি – ঘটের আকৃতির ঘটি বিশেষ
খোলাখুলি – মুড়ি ভাজার জন্য ব্যবহৃত দুটি মাটির পাত্র, বড়টাকে বলে 'খোলা' ছোট পাত্র যেটাতে মুড়ি ভাজা হয় বালির উত্তাপে সেটি 'খুলি'। এই মুড়ি ভাজা প্রসঙ্গে একটি শব্দ। আমরা পেয়েছি 'ওঁচা' শব্দটি। 'ওঁচা' হল মুড়ি ভাজার আগে চালগুলিকে বড় পাত্রটিতে রেখে নারকেল পাতার কাঠির সাহায্যে নাড়াচাড়া করে নেওয়াকে 'ওঁচা' বলা হয়। আর কাটিগুলিকে বলা হয় 'ওঁচকাঠি'। এবং এখানে আরও একটি শব্দ পাই 'বাঁদি'। ত্রিকোনাকৃতির উনানে কাঠের জ্বালে যখন মুড়ি ভাজা হয় তখন আগুনের হল্কা থেকে বাঁচার জন্য গোবরের সাহায্যে তৈরী করা বিশেষ আড়ালকে বলা হয় 'বাঁদি'।
গড় করা – প্রণাম করা

ধুচনী – চাল ধোবার জন্য বিশেষ ছিত্রযুক্ত পাত্র।
জামবাটি – বিশেষ আকৃতির বড় বাটিকে বোঝায়। (পিতল বা কাঁসার দিয়েই সাধারণত তৈরী হয়)

এভাবেই দেখা যায় গ্রামীণ হাওড়ার কথ্যভাষা রাঢ়ী হলেও কিছু কিছু নিজস্ব আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অতিরিক্ত হিসাবে রয়ে গেছে, যা গ্রামীণ হাওড়ার কথ্য ভাষার নিজস্ব সম্পদ। পূর্বে গ্রামীণ জনপদ ছিল শহর থেকে বিচ্ছিন্ন, বর্তমানে হাওড়া জেলায় যথার্থ গ্রাম বলে কিছু নেই, প্রতিটি গ্রামই প্রায় আধাশহর না হয় মফঃস্বল কিংবা বড় শহরের সঙ্গে যথার্থ ভাবে যুক্ত এবং শিক্ষা দীক্ষা সবই শহরমুখী সেজন্য গ্রামীণ কথ্যভাষায় পাচ্ছে তার ভিন্নরূপ। শহরকেন্দ্রিক মিশ্রভাষার প্রতি টান গ্রামীণ শিক্ষিতজনের। সেই কারণে প্রচলিত বিষয়গুলি অনেকক্ষেত্রেই আর বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে না, ফলে দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে গ্রামীণ ছাঁদ। এখনো যারা বয়স্ক প্রাচীনরা বর্তমান তাদের মধ্যে এখনো পূর্ণমাত্রায় গ্রামীণ বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় আছে। হতে পারে তারা অশিক্ষিত এবং উচ্চারণে কিছুটা অশিষ্ট তথাপি তারাই গ্রামীণ হাওড়ার আঞ্চলিক অতিরিক্ত ভাষাবৈশিষ্ট্যগুলি বহন করে চলেছে।

বিঃদ্রঃ প্রবন্ধটি সম্পূর্ণরূপে ক্ষেত্রসমীক্ষা এবং তুলনামূলক পদ্ধতিতে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে লেখা। কোন গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়নি।